ফ্রান্সের বিরোধ দেখা দেয়। ১৮৬৯ সালে প্রজাবিদ্রোহের মুখে স্পেনের রানী ইসাবেলা দেশ ত্যাগ করলে স্পেন-এর অভিজাতগোষ্ঠী দক্ষিণ-পশ্চিম জার্মানির এক ক্ষুদ্র রাজ্যের যুবরাজ লিওপোল্ডকে স্পেনের সিংহাসনে বসার আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু প্রাশিয়া ও স্পেন একই হোহেনজোলার্ন বংশের হাতে চলে যাবে, এটা মেনে নিতে রাজি হননি ফরাসি সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন। তিনি কাউন্ট বেনেদিতিকে দূত হিসেবে এমস্ নামক এক স্বাস্থ্যনিবাসে প্রাশিয়ারাজ প্রথম উইলিয়মের কাছে পাঠিয়েছিলেন ফ্রান্সের আপত্তি জানাবার জন্য। প্রথম উইলিয়ম সে আপত্তি অগ্রাহ্য করেন এবং খবরটি টেলিগ্রাম করে বিসমার্ককে জানান। চতুর বিসমার্ক 'এমস টেলিগ্রামে'র অংশবিশেষ বিকৃত বিবরণসহ এমনভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন, যাতে মনে হয় ফরাসি দূত জার্মানির হাতে অত্যন্ত অপমানিত হয়েছেন। ফরাসি জনমত প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তৃতীয় নেপোলিয়নের ওপর চাপ সৃষ্টি করে এবং সম্রাট প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে বাধ্য হন। ১৮৭০-এর সেপ্টেম্বরে সেডানের যুদ্ধে ফরাসিবাহিনী প্রাশিয়ার হাতে বিধ্বস্ত হয়। ১৮৭১-এর মে মাসে সম্পাদিত ফ্রাঙ্কফুর্ট চুক্তি অনুযায়ী ফ্রান্স আলসাস লোরেন, মেৎস দুর্গ, স্ট্রাসবুর্গ প্রাশিয়ার হাতে তুলে দেয় এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে পাঁচশ কোটি ফ্রাঁ প্রাশিয়াকে দিতে রাজি হয়। দক্ষিণ জার্মানির ক্যাথলিকদের সব রকম সাহায্য দেওয়া থেকে ফ্রান্স বিরত হয়। ফলে দক্ষিণ জার্মানির রাজ্যগুলো অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রোটেস্ট্যান্ট প্রাশিয়ার নেতৃত্ব মেনে নেয় এবং উত্তর জার্মান রাষ্ট্রসংঘের সঙ্গে যুক্ত হয়। এইভাবেই জার্মানি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাশিয়ার রাজা ঐক্যবদ্ধ জার্মানির সম্রাট হিসেবে স্বীকৃত হন। বিসমার্ক হন নতুন জার্মানির চ্যান্সেলর।

৫.১২ মূল্যায়ন

গণ-আন্দোলনের পথ ত্যাগ করে জার্মান জাতি-রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল। এরপরেও বহু জার্মান ভাষাভাষী অঞ্চল জার্মানির বাইরে থেকে গিয়েছিল। সিম্যান বিসমার্ককে 'a man with a limited objective' বলে সমালোচনা করেছেন, কেননা জাতীয়তাবাদী দলের সমর্থন কৌশলে আদায় করে যুদ্ধনীতির সাহায্যে বিসমার্ক যে জার্মান রাষ্ট্র তৈরি করেছিলেন, তা ছিল ক্ষুদ্র জার্মান তত্ত্বের বাস্তব প্রকাশ। জাতীয়তাবাদীরা চেয়েছিলেন জার্মান রাষ্ট্রে প্রাশিয়ার বিলুপ্তি, বিসমার্ক ঘটিয়েছিলেন প্রাশিয়ারাষ্ট্রে জার্মানির বিলুপ্তি। সেই অর্থে জার্মানির ঐক্য ছিল প্রাশিয়ার প্রাধান্য অর্জনের প্রয়াসের প্রায়োগিক পরিণতি। ডেভিড টমসন ভুল বলেননি যে ডেনমার্কের প্রতি, অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের প্রতি যে নীতি বিসমার্ক গ্রহণ করেছিলেন, তা শুধু প্রাশিয়ার শক্তি বিস্তারের উদ্দেশ্যেই।

কিন্তু তবু বিসমার্ককে জার্মান জাতি রাষ্ট্র থেকে আলাদা করে ভাবা সম্ভব নয়। দূরদৃষ্টি নিয়ে নির্দিষ্ট পরিকল্পনামাফিক কাজ করবার যে দক্ষতা তিনি দেখিয়েছিলেন, তা উনিশ শতকের ইউরোপের ইতিহাসে একটা দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

জার্মান জাতি-রাষ্ট্র সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। প্রাশিয়ার সুবিধাবাদ, বলপ্রয়োগের নীতি এসব ত্রুটি অবশ্যই ছিল। কিন্তু তবুও উনিশ শতকের ইউরোপের ইতিহাসে জার্মান জাতিরাষ্ট্রের গঠন ফরাসি বিপ্লবের মতোই সুদূরপ্রভাবী ঘটনা। পরবর্তীকালে জার্মান জাতির উগ্রতা ইতিহাসের সমস্যা তৈরি করেছিল, কিন্তু সেই সময়ে ইউরোপীয় মনীষায় জার্মানির একটি উজ্জ্বল স্থান ছিল। জার্মানি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পর ব্রিটিশ দার্শনিক কার্লাইল

'Times' পত্রিকায় লিখেছিলেন, "That...Germany should be at length welded into a nation and become Queen of the continent...seems to me the hopefullest public fact that has occurred in my time."

৫.১৩ অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে ভাঙন

ইতালি ও জার্মানি যখন ইউরোপে বৃহৎ জাতি-রাষ্ট্রের কাঠামো হাজির করেছিল, ঠিক সেই সময়েই স্পষ্ট হয়েছিল পুরনো ধাঁচের সাম্রাজ্যগুলোর ভাঙন। দুটো সাম্রাজ্যের কথাই এই প্রসঙ্গে আলোচ্য। একটি হল অস্ট্রিয়ার হ্যাপস্‌বুর্গ সাম্রাজ্য আর অন্যটি অটোমান তুর্কী সাম্রাজ্য।

অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্য ছিল দশ-বারোটি জাতির সমাবেশ স্থল। ছিল জার্মান, হাংগারিয়ান ম্যাগিয়ার আর নানা উপজাতির লোক—যেমন রুমেনিয়ান, চেক, স্লোভাগ, সার্ব, পোল ইত্যাদি। ইতালি ও জার্মানিতে জাতি-রাষ্ট্র স্থাপন এইসব জাতি উপজাতির মনেও জাতীয়তাবাদী ঢেউ তুলে দিয়েছিল। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের ঢেউ, হাংগারিতে কোসুথের (Kossuth) নেতৃত্বে বিদ্রোহ অস্ট্রিয়ারাজ নিষ্ঠুরভাবে সামাল দিয়েছিলেন, কিন্তু ১৮৬০-এর দশকে তিনি আর তা পারেননি। ১৮৬৭ সালে অস্ট্রিয়ারাজ ফ্রান্‌জ জোসেফ হাংগারীর জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে বাধ্য হন। এই আপোষরফা (Ausgleich) নামে পরিচিত। বিদেশনীতি ও প্রতিরক্ষা ছাড়া অন্য সব বিষয়ে হাংগারীকে স্বায়ত্তশাসন দিয়ে দেন, প্রতিষ্ঠিত হয় অস্ট্রো-হাংগেরীয় দ্বৈতশাসন। ১৮৬৮-তে হাংগারীর দুই নেতা ডিক (Deak) ও এওত্বোস (Eotvos) আবার ক্রোটদের স্বতন্ত্র শাসনের প্রতিশ্রুতি দেন। এই প্রতিশ্রুতি যদিও রক্ষিত হয়নি এবং এরপরেও সার্ব, রুমানীয়, স্লোভাক প্রভৃতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার জোর খাটিয়েই দাবিয়ে রাখা হয়, কিন্তু অস্ট্রিয়া-সাম্রাজ্যে ভাঙ্গানের চিহ্ন তখন থেকেই ছিল স্পষ্ট, এবং তা সম্পূর্ণ হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের পর হাংগারীর স্বাধীনতা প্রাপ্তির ফলে।

৫.১৪ তুর্কী সাম্রাজ্যের ভাঙন

অটোমান তুর্কীরা ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের বল্কান উপদ্বীপে এসেছিল পনেরো শতকে; কনস্টানটিনোপল তাদের দখলে আসে ১৪৫২ সালে। গড়ে ওঠে বিশাল তুর্কী সাম্রাজ্য। কৃষ্ণসাগরের তীর থেকে ভূমধ্যসাগরের ক্রীট ও সাইপ্রাস, আফ্রিকা উত্তরাংশ-মিশর থেকে মরক্কো পর্যন্ত আর লেবানন থেকে আরব ভূখণ্ড পর্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন কনস্ট্যানটিনোপল-ইস্তাম্বুলের তুর্কী সুলতান।

আঠারো শতক থেকেই এই তুর্কী সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়তে শুরু করেছিল। অস্ট্রিয়া-রাশিয়ার চাপে, নেপোলীয়নীয় ধাক্কায় আর মেটারনিখ ব্যবস্থার আঘাতে তুর্কী সাম্রাজ্য ক্রমশ আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে ফরাসি বিপ্লবের স্বাধীনতার বাণী তুর্কী-অধীন ছোট ছোট জাতিগুলোকে উদ্বুদ্ধ করতে শুরু করে তুর্কী শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহী হয় সার্বরা। ১৮২৭ সালে তারা সীমিত স্বায়ত্তশাসন লাভ করে। এরপর স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু করে গ্রীকরা। মেটারনিখ-এর বিরোধিতা করা সত্ত্বেও, ফ্রান্স, প্রাশিয়া, ব্রিটেন, রাশিয়ার প্রশ্রয় গ্রীক খ্রীস্টানরা পেয়েছিল। তারা স্বাধীন হয়ে যায় ১৮৩০ সালে। এরপর স্বাধীন হয় রুমানিয়া ১৮৫৬ সালে।

এইভাবে একের পর এক স্বাধীনতা আন্দোলন আর বল্কান জাতীয়তাবাদের ধাক্কায় ক্রমেই তুরস্ক 'sickman of Europe' এ পরিণত হয়। শুধু খ্রিস্টানরাই নয়, মিশর-আলবেনিয়ার জাগরণও তুরস্কের সমস্যা তৈরি করেছিল। এই সুযোগে রাশিয়া চেয়েছিল তুর্কী সাম্রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করতে। কিন্তু রাশিয়ার এই প্রয়াসে আপত্তি ছিল ইংরেজদের। কারণ মিশর হয়ে লোহিতসাগর তীর ধরে ভারতের সঙ্গে তাদের বাণিজ্যপথ চালু ছিল। তুরস্কের ওপর রুশ আধিপত্যে সেই পথ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। বল্কান অঞ্চলে অস্ট্রিয়া রাশিয়ার প্রাধান্য দেখতে প্রস্তুত ছিল না। ভূমধ্যসাগরে রুশ শক্তিবৃদ্ধি ইতালিরও পছন্দ ছিল না।

কিন্তু গ্রীকচার্চের খ্রিস্টানদের নিরাপত্তারক্ষার অজুহাতে রাশিয়া বল্কান অঞ্চলে হাত বাড়াতে ছিল বদ্ধপরিকর। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালিও তাকে বাধা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। এর ফলেই হয়েছিল ১৮৫৪-৫৬-র ক্রিমিয়ার যুদ্ধ। এই যুদ্ধে হেরেও রাশিয়া নিরস্ত হয়নি। তার মদতক্রমেই বল্কানদের জাতীয় আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৮৭০-এর দশকের বল্কান যুদ্ধের পর বুলগেরিয়া, সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রো তুর্কী সাম্রাজ্য ভেঙে বেরিয়ে আসে। ১৮৭৮-এর বার্লিন চুক্তিতে এই রাজ্যত্রয়ের পৃথক অস্তিত্ব ইউরোপ মেনে নেয়। তবে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা তুরস্কের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে অস্ট্রিয়ার হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের স্বার্থসন্ধান যাই হোক না কেন, একদিকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আর অন্যদিকে রাষ্ট্র-কূটনীতির অভিঘাতে তুরস্ক সাম্রাজ্য দ্রুত ভাঙনের দিকে এগিয়ে যায়। এই ভাঙন সম্পূর্ণ হয় প্রথম মহাযুদ্ধের পর।

৫.১৫ সারসংক্ষেপ

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ছিল বৃহৎ জাতিরাষ্ট্র গঠনের যুগ। জাতীয় চেতনা, ঐক্যের চেতনা ইতালি ও জার্মানির রাজ্যগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত গণ আন্দোলন নয়, কূটনীতি ও যুদ্ধের মাধ্যমে ভিয়েনা ব্যবস্থা ধ্বংস করে ইতালি ও জার্মানি ঐক্যবদ্ধ হয়। ইতালিতে এই জাতিরাষ্ট্রগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন মাৎসিনি—কাভুর ও গ্যারিবল্ডি। জার্মান ঐক্যের নায়ক ছিলেন বিসমার্ক।

এই পর্বেই আবার জাতীয়তাবাদী ও স্বাধীনতাকামী আন্দোলনের প্রবণতা অস্ট্রিয়া ও অটোমান তুর্কী সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরায়। সুতরাং উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ একইসঙ্গে ছিল গঠন ও ভাঙনের যুগ।

৫.১৬ অনুশীলনী

বড় প্রশ্ন :

১। ইতালির ঐক্য আন্দোলনে মাৎসিনি, কাভুর ও গ্যারিবল্ডির অবদানের তুলনামূলক আলোচনা করুন। এই আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা কি?

২। জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াসে বিসমার্ক কিভাবে রক্ত ও লৌহের নীতি প্রয়োগ করেছিলেন? এর নেতিবাচক দিক কি?

৩। উনিশ শতকে কিভাবে অস্ট্রিয়া ও অটোমান তুর্কী সাম্রাজ্যে ভাঙন দেখা দিয়েছিল?

ছোট প্রশ্ন :

১। ইতালির জাতীয় চেতনা উন্মেষের কারণ কি?

২। মাৎসিনির রাজনৈতিক দর্শন কি ছিল?

৩। মাৎসিনির সঙ্গে কাভ্যুরের রাজনীতির তফাত কোথায়?

৪। বিসমার্কের রাজনৈতিক ধারণার ব্যাখ্যা করুন।

৫। জার্মানির ঐক্যে জোলভেরিনের ভূমিকা কি ছিল?

৬। জার্মানির ঐক্য আন্দোলনে লিবারলদের অবদান কি?

৭। "এমস্ টেলিগ্রাম"-এর ঘটনাটি আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। 'কনসিলিয়েটর' কি?

২। ইতালির কয়েকজন জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীর নাম করুন।

৩। উনিশ শতকে ইতালিতে গুপ্তসমিতি কিভাবে গড়ে উঠেছিল?

৪। Risorgimento কি?

৫। "ইয়ং ইতালি" কিভাবে গঠিত হয়?

৬। পাদ্রী জিওবার্টি কে?

৭। জুরিখের সন্ধি কেন হয়েছিল?

৮। গ্যারিবল্ডির বাহিনীর নাম কি ছিল?

৯। "Confederation of the Rhine" কাকে বলা হত?

১০। ইউরোপের "Sickman" কে?

৫.১৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। Bolton King : A History of Italian Unity

২। G. P. Gooch : Germany

৩। G. Barraclough : Rise of Modern Germany

৪। W. W. Simon : Germany in the Age of Bismarck

৫। J. Grenville : Europe Reshaped

৬। A. J. P. Taylor : Struggle for Mastery of Europe

৭। A. J. P. Taylor : Europe-Gramdeur and Decline

এস. এইচ. আই - ৩
ইতিহাসের ঐচ্ছিক পাঠক্রম
পর্যায় ঃ ২

একক ১(ক) ❑ শিল্প-বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের উদ্ভব

গঠন

১(ক).০ উদ্দেশ্য

১(ক).১ প্রস্তাবনা

১(ক).২ শিল্প-বিপ্লবের সংজ্ঞা

১(ক).৩ শিল্প-বিপ্লবের সময়

১(ক).৪ শিল্প-বিপ্লবের পটভূমিকা

১(ক).৫ ইংল্যান্ডে কেন শিল্প-বিপ্লব আগে দেখা দিল?

১(ক).৬ শিল্পায়নের দুই পর্ব

১(ক).৭ শিল্প-বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য

১(ক).৮ ইংল্যান্ড ভিন্ন অন্য দেশে শিল্প-বিপ্লব

১(ক).৯ নতুন আবিষ্কার : কৃষিতে বিপ্লব

১(ক).১০ নতুন আবিষ্কার : বস্ত্র-শিল্পে বিপ্লব

১(ক).১১ নতুন আবিষ্কার : যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লব

১(ক).১২ শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল ও গুরুত্ব

১(ক).১২.১ নতুন ফ্যাক্টরি ব্যবস্থা

১(ক).১২.২ নিঃস্ব মানুষের আবির্ভাব ও সমাজতন্ত্রের জন্ম

১(ক).১২.৩ শিল্প-বিপ্লব কি সমাজ-বিবর্তনে ছেদ এনেছিল?

১(ক).১৩ সারাংশ

১(ক).১৪ অনুশীলনী

১(ক).১৫ গ্রন্থপঞ্জী

১(ক).০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে আপনি জানতে পারবেন

- শিল্প-বিপ্লব কাকে বলে, কবে এ বিপ্লব হয়েছিল, কেন হয়েছিল, কেন হয়েছিল ও তার ফলাফল কী?
- মানব-সভ্যতায় এ বিপ্লবের স্থান কোথায়?
- কেন ইউরোপ বিগত কয়েকশ বছর ধরে পৃথিবীতে এত প্রাধান্য বিস্তার করেছে—তার শক্তির উৎসস্থল কী?
- কেন ইংল্যান্ড শিল্পায়িত আধুনিকতায় বিশ্বে প্রথম?
- কীভাবে শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল থেকে জন্ম নিল সমাজতন্ত্রের দর্শন।

১(ক).১ প্রস্তাবনা

১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব মানুষকে শুনিয়েছিল তিনটি বাণী—স্বাধীনতা (Liberty), সৌভ্রাত্র (Fraternity) এবং সাম্যের (Equality) তিনটি বাণী—মানুষের সমাজ ও মনোবিপ্লবের তিনটি তড়িৎ উপাদান। একই সময়ে—এবং তার আগে ও পরে—ইংল্যান্ডে ঘটছিল আরেক পরবির্তন। মানুষ—পদার্থ প্রকৃতির অন্তর্নিহিত উদ্দীপনশক্তিকে (energy) একটি সমন্বয়ের মধ্যে এনে এমন সব ক্ষমতার উদ্ভাবন ঘটানো হচ্ছিল যার দ্বারা অনড়কে সচল করা যায়, মন্দ-গতিকে ঝড়ের বেগ দেওয়া যায় এবং স্থবিরকেও স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া যায়। প্রযুক্তিতে বিজ্ঞানকে ব্যবহার (application of science to technology) করে আবিষ্কার করা হচ্ছিল নতুন যন্ত্র ও নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা। আসছিল যন্ত্রায়িত উৎপাদনের (mechanised production) যুগ। মানুষের ও পশুর পেশী শক্তির সীমা, বায়ু ও জলশক্তির অনিশ্চয়তা ইত্যাদি নিয়ে মানুষ অনেকদিন ধরে বিড়ম্বনা ভোগ করছিল। অতএব তার দরকার হচ্ছিল নতুন উত্তোলকের যার উত্তোলন ক্ষমতা বেশি। দরকার হচ্ছিল নতুন যন্ত্রের যার সঞ্চালন ক্ষমতা অধিক। দরকার হচ্ছিল নতুন জ্বালানি (fuel) ও উদ্দীপক শক্তির (energy) যার উচ্চতর তাপ প্রদানের ক্ষমতা বেশি। আর দরকার হচ্ছিল শক্ত ধাতব পাত যা চিরাচরিত কাঠের পাটাতনের থেকে বেশি মজবুত হতে পারে। এই সব প্রয়োজনগুলিকে মিটিয়েছিল ইংল্যান্ডের এবং পরে ইউরোপের অন্যান্য স্থানের ও আমেরিকার শিল্প-বিপ্লব। দীর্ঘকাল ইউরোপ ও পৃথিবী কৃষি-অর্থনীতির উপর নিজের সভ্যতাকে দাঁড় করিয়েছিল। এবার এই কৃষি—অর্থনীতির পাশে আস্তে আস্তে মাথা তুলে দাঁড়াতে লাগল আধুনিক অর্থনীতি—শিল্প অর্থনীতি— যার অনুষঙ্গে গড়ে উঠল নগরায়ণের ধারা, নগরবসতির নতুন বিন্যাস।

আসলে দেখা গেল সমাজ ও অর্থনীতির মধ্যে একসঙ্গে ছয় রকমের পরিবর্তন আসছে যে পরিবর্তনগুলি একটি আরেকটির দ্বারা তাড়িত ও প্রভাবিত—একটির সাথে আরেকটির অঙ্গ-সংযোগ (organic unity) রয়েছে। যেমন, (এক) কৃষিতে ভাঙন—কৃষিমানবের স্থানান্তর গমন—নতুন যন্ত্র প্রয়োগের দ্বারা কৃষিতে নতুন সংস্থান।

এর ফল হল কৃষির আড়ষ্টতা থেকে মনে, শরীরী উপস্থাপনায় ও জীবিকায় সতত চলমান থাকার নতুন ক্ষমতার আবির্ভাব। (দুই) নতুন যন্ত্রের আগমন—নতুন ফ্যাক্টরি ব্যবস্থা—নতুন শিল্পপতি ও পুঁজিপতি শ্রেণীর উদ্ভব। এর সঙ্গেই আত্মপ্রকাশ করেছিল নতুন শ্রমিক শ্রেণী, সূচিত হয়েছিল নতুন শ্রমিক আন্দোলনের। এই (এক) আর (দুই) মিলে আনল নতুন পরিবর্তন যাকে বলা যেতে পারে উৎপাদনে **নতুন সঞ্চার** (new movement)। যন্ত্রের উৎপাদনই মূলত এর জন্যে দায়ী। (তিন) যন্ত্রের সাথে এল নতুন উত্তোলন, নতুন পরিবহন, নতুন সঞ্চারণ। মানুষ জয় করল পেশী শক্তির সীমা, জল ও বায়ু শক্তির অনিশ্চয়তা। (চার) যখনই মানুষ তার সীমাকে অতিক্রম করতে শিখল তখনই তার বন্ধন অসহিষ্ণু মনকে একটি শৃঙ্খলাবোধের মধ্যে রেখে এক নতুন লক্ষ্যে অভিনিবিষ্ট রাখার দরকার হল। এল নতুন জাতীয় অর্থনীতি (New National economy)। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যকে পরিশীলিত নীতির মধ্যে পরিচালিত করার দরকার হল। (তিন) ও (চার) ভাবনার জগতে আনল নতুন পরিবর্তন যাকে বলা যেতে পারে **নয়া নীতি** (New Policies)। (পাঁচ) নতুন উৎপাদন ও বিপণনের জন্য চাই বাজার। আরম্ভ হল বাজার খোঁজার জন্য দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ার চেষ্টা—নতুন সাম্রাজ্য, নতুন উপনিবেশ দখল করার বিশ্বময় প্রতিদ্বন্দ্বিতা। (ছয়) তার সাথে তাল রেখে শুরু হল ব্যাপকভাবে জাতি সম্প্রসারণ (race-expansion)। অর্থাৎ (পাঁচ) ও (ছয়) মিলে দ্বার খুলে দিল এক নতুন পরিবর্তনের যাকে বলা যেতে পারে অভিনব **পরস্পর-নির্ভরতা** (New interdependence)।

এই প্রারম্ভিক কথাগুলি যদি অনুসরণ করেন তবে আপনাদের শিল্প-বিপ্লব বোঝা সহজ হবে।

আসুন আমরা এবার শিল্প-বিপ্লবের গভীরতর পাঠের দিকে যাই।

১(ক).২ শিল্প-বিপ্লবের সংজ্ঞা

শিল্প-বিপ্লব বলতে বোঝায় একটি দ্রুত পরিবর্তনের ধারা যার দ্বারা হস্তনির্মাণ ব্যবস্থার (handicraft) থেকে উত্তরণ ঘটল যন্ত্র-নির্মাণ ব্যবস্থায় (machine manufacture), কুটির শিল্প (Cottage industry) থেকে উদ্যোগ প্রসারিত হল বড় কারখানা শিল্পে (factory system) এবং শিল্পের চালিকা শক্তি হিসাবে পেশী-শক্তির (muscle power) বিকল্পে দেখা দিল প্রথমে বাষ্প-শক্তি (steam power) এবং পরে বিদ্যুৎশক্তি (Electrical power)। এর ফলে কৃষিব্যবস্থার বিপুল পরিবর্তন হল এবং অর্থনীতি যা একসময়ে কৃষিনির্ভর ছিল তা শিল্প-নির্ভর হয়ে পড়ল। নগরায়ণ ত্বরান্বিত হল, নগরে কারখানা-কেন্দ্রিক (factory-centric) নতুন জীবনব্যবস্থা গড়ে উঠল আর তার সাথে তাল মিলিয়ে অসংখ্য নারী-পুরুষ শহুরে কারখানাগুলির চারপাশে সারিবদ্ধ শ্রমিক হিসাবে বস্তির মধ্যে বসতি স্থাপন করল। আত্মপ্রকাশ করল নিম্নগামী জীবনে নিমজ্জমান সর্বহারার দল—প্রলেটারিয়েট—যাদের মুখোমুখি কলকারখানার মালিক পুঁজিপতিরা ক্রমবর্ধমান মুনাফা অর্জনের মধ্য দিয়ে স্ফীত হতে লাগল। এর সাথে বেড়েছিল যোগাযোগ—কৃষির সাথে শিল্পের দেয়া-নেয়া—আর অধিক পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে বেড়েছিল বাণিজ্য। বাণিজ্যের সঙ্গে বাড়ল বাজার খোঁজার তাগিদ—সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশ গঠনের নেশা। দেখা দিল ডাক-তার-রেল ব্যবস্থা। সমাজে প্রকট হয়ে উঠল শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্ব। মানুষের বিপন্ন অস্তিত্বকে বুকে নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল সমাজ-পরিবর্তনের দাবি। এক মরিয়া-সমাজের পরিবর্তনকামিতা থেকে জন্ম নিল সমাজতন্ত্রের দর্শন।

১(ক).৩ শিল্প-বিপ্লবের সময়

শিল্প-বিপ্লব সম্বন্ধে প্রথম দৃষ্টিগোচর করার চেষ্টা করেন প্রথম দিকের ফরাসী লেখকরা। কিন্তু যিনি প্রথম 'শিল্প-বিপ্লব'— 'Industrial Revolution'—শব্দ দুটি একটি অতিদ্রুত বিশেষ অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সূচকরূপে বর্ণনা করেছিলেন তিনি হলেন ঐতিহাসিক আরনল্ড টয়েনবি (Arnold Toynbee : 1852-83) তিনি ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিস্ময়কর গতিকে বোঝানোর জন্য এই অভিধাটি ব্যবহার করেন। এরিক হব্‌সবম (E. J. Hobsbawm) লিখেছেন যে অনেকদিন ধরেই ইংল্যান্ডে শিল্পোন্নতি-জনিত অর্থনৈতিক প্রসার চলছিল। ১৮২০-র দশকের আগে ফরাসি ও ইংরাজ সমাজতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবীরা এ ঘটনার সম্যক চরিত্রটি বুঝতে পারেননি এবং ১৮৩০-এর দশকের আগে, আরও শানিত করে বললে ১৮৪০-এর দশকের আগে—বিরাট কোন শিল্প পরিবর্তনের প্রভাব ইংল্যান্ডের বাইরে ইউরোপীয় মহাদেশে বা তার বাইরে বৃহত্তর পৃথিবীতে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। মোটামুটিভাবে ফরাসী দেশে রাজনৈতিক বিপ্লবের কথা ও প্রভাবকে মাথায় রেখে সমকালীন আরেকটি দ্রুত অলক্ষ্যচারী পরিবর্তনকে বোঝানোর জন্য বিপ্লব শব্দটি বুদ্ধিজীবীদের চিন্তায় আসা-যাওয়া করছিল। অবশেষে আরনল্ড টয়েনবির (Arnold Toynbee) আলোচনার সূত্র ধরে এই অভিধাটি সার্বিক ব্যবহারের যোগ্যতা অর্জন করে তবে শিল্প-বিপ্লবের কবে শুরু এবং কবে শেষ এ নিয়ে আজ পর্যন্ত কোন ঐক্যমত ঐতিহাসিকদের মধ্যে গড়ে ওঠেনি। জনৈক জার্মান অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক হফ্‌ম্যান (Professor W. Hoffman) ইংল্যান্ডের শিল্পোন্নতির পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করে বলেছেন যে বার্ষিক শতাংশ হারে ('annual percentage rate') ১৭৮০ সালে ইংল্যান্ডের একক উন্নয়ন সর্বপ্রথম দুই-এর বেশি হল অর্থাৎ সমহারে উন্নয়নের দ্বিগুণ হল এবং এই মাত্রায় তা স্থির ছিল প্রায় শতাব্দীকাল। এই পরিসংখ্যান তত্ত্বকে মাথায় রেখে বিখ্যাত ঐতিহাসিক **ফিলিস ডিন** (Phyllis Deane) লিখলেন 'তাহলে আধুনিক প্রথা হচ্ছে প্রথম শিল্প-বিপ্লবের ১৭৮০-র দশকে সূচিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া কারণ সেই সময় থেকে ব্রিটিশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ঊর্ধ্বগতি দেখা যায়' (The current convention then is to date the first industrial revolution from the 1780's when the statistics of British international trade show a significant upward movement')। এই ধরনের উন্নয়নের কথা ভেবেই অধ্যাপক রস্টো (Professor W. Rostow) বলেছেন যে ইংল্যান্ডে নিশ্চিত শিল্পোন্নতির অধ্যায়টি ছিল ১৭৮৩ থেকে ১৮০২ খ্রিস্টাব্দ যে সময়কে তিনি বলেছেন 'আধুনিক সমাজগুলির জীবনে বড় জল-বিভাজিকা' ('the great watershed in the life of modern Societies')। এই সময়ের মধ্যেই সুনিশ্চিত নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নের উত্তরণ ('take off into sustained growth') হয়েছিল বলে তিনি মনে করেন। অধ্যাপক রস্টোর বিপরীত কোটিতে দাঁড়িয়েছিলেন অধ্যাপক নেফ (Professor Nef)। তাঁর মতে রানি প্রথম এলিজাবেথের সময়ে যে ধনতান্ত্রিক শিল্পব্যবস্থা গড়ে উঠছিল তার মধ্যেই লুকিয়েছিল শিল্প-বিপ্লবের ভ্রূণ। এইভাবে অধ্যাপক নেফ সূচনার প্রান্তসীমাকে কয়েক শতাব্দী পেছনে ঠেলে দিলেন আর অধ্যাপক রস্টো তাকে সঙ্কুচিত করে দিলেন নাটকীয় বিকাশের কয়েক দশকের মধ্যে। মোটামুটিভাবে আমরা আমাদের আলোচনায় এসব কথা মাথায় রেখেও অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধকেই আমাদের আলোচনার কাল ধরে নেব।

১(ক).৪ শিল্প-বিপ্লবের পটভূমিকা

শিল্প-বিপ্লবের একটি নিশ্চিত পটভূমিকা ছিল। এই পটভূমিকার আদিসীমা ষোড়শ শতাব্দী। ঐতিহাসিক এল. সি. এ. নোলস্ (L.C.A. Knowles) লিখেছেন যে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মৌলিকত্ব ও দ্রুততার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে উনিশ শতকের সঙ্গে তুলনা করা চলে শুধুমাত্র ষোড়শ শতাব্দীর। এই শেষোক্ত শতাব্দীতেই প্রথম সামুদ্রিক ও বাণিজ্যিক আবিষ্কারের ফলাফল বিশেষভাবে অনুভূত হতে থাকে। ভারতবর্ষ ও দুই আমেরিকার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হওয়ার সাফল্যের সাথে আত্মপ্রকাশ করল নতুন বাণিজ্যের উদ্ভাবন, নতুন সমুদ্রযাত্রী নাবিকের হাত ধরে এল নতুন বণিক, নতুন উপনিবেশ গড়ার স্বপ্ন, নতুন দুনিয়ার ধন—সোনারূপা, ফসল ও মানবশক্তিকে লুঠ করে নেওয়ার বেপরোয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা, জাতিতে-জাতিতে লড়াই, নবলব্ধ পুঁজির ঘনীভবন আর তার প্রভাবে শিল্পোদ্যোগের নয়া প্রচেষ্টা। ইউরোপ যুক্ত হল বিশ্বের সঙ্গে, বিশ্ব উন্মুক্ত হল ইউরোপের কাছে। এদিকে মহাদেশের ভেতরে হাজার বছরের পুরানো প্রতিষ্ঠান সামন্ততন্ত্র জীর্ণ হতে শুরু করল। সার্ফ ব্যবস্থা ভেঙে যেতে লাগল। গ্রামাঞ্চলের মানবশক্তি চুয়ে চুয়ে শহরে আসতে লাগল। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আত্মপ্রকাশ করল ধর্মসংস্কার—রিফরমেশন—ধর্মতন্ত্র নড়ে উঠল, রাষ্ট্রতন্ত্র সজাগ হল মানুষ নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হল। দেশ থেকে দেশান্তরে এক বিশাল সম্ভাবনার দ্বারে এসে দাঁড়াল মানবসমাজ। এই রকম পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইউরোপের সবদেশের প্রতিক্রিয়া এক ছিল না। পর্তুগাল ও স্পেন প্রথম পর্বের দুই সামুদ্রিক শক্তি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল নয়া দুনিয়ার সম্পদ। পর্তুগাল পূর্বদিকের সাম্রাজ্য আর মূল্যবান মশলা-বাণিজ্য থেকে আহৃত সম্পদ নিয়ে তৃপ্ত রইল। স্পেন মগ্ন রইল তার নববিশ্ব (New world) এবং দক্ষিণ আমেরিকার রৌপ্য খনিগুলি নিয়ে। প্রথম পর্বের এই দুই ক্যাথলিক শক্তি তাদের আহৃত সম্পদকে যতখানি ভোগের মধ্যে অপচয়িত করেছিল ততখানি অভ্যন্তরীণ উদ্ভাবনশীল সংগঠনের কাজে ব্যবহার করতে পারেনি। অচিরেই তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দেখা দিল দুটি প্রটেস্ট্যান্ট রাজ্য—ইংল্যান্ড ও হল্যান্ড। এই দুই রাজ্য পূর্বতন প্রতিদ্বন্দ্বীদের সামুদ্রিক আধিপত্য ভেঙে দিল। উত্তর আমেরিকায় ইংল্যান্ড প্রতিষ্ঠা করল নিজের উপনিবেশ। ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেন ও পর্তুগাল বিশ্বসম্পদকে হাজির করেছিল ইউরোপের দরজায়। সপ্তদশ শতাব্দীতে সেই কাজ করল হল্যান্ড। এই শতাব্দীতে বিশ্ববাণিজ্যের কেন্দ্র হয়ে উঠল আমস্টারডাম (Amsterdam)। ঐতিহাসিকের ভাষায়—"....Amsterdam was the exchange place of Europe"। এইবার ওলন্দাজদের অনুকরণ করতে লাগল ইংরাজরা। আঠারো শতকে তারাই হয়ে উঠল প্রধান।

দুটি কথা এখানে লক্ষণীয়। এক, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি হ্যাপস্‌বার্গ সাম্রাজ্য একটি বড় শক্তি হলেও সামুদ্রিক বাণিজ্যে এবং বিশ্বসম্পদ ভাগ-বাটোয়ারার ক্ষেত্রে কোন সুবিধা করতে পারেনি। আঠারো শতকে ফ্রান্স, ইংল্যান্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও তার অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রিয় কাঠামো ইংল্যান্ডের মতো সবল ছিল না। ফলে বিশ্বসাম্রাজ্যের প্রতিযোগী হিসাবে ফ্রান্স ছিল ইংল্যান্ডের দুর্বল প্রতিদ্বন্দ্বী। আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে শিল্প-বিপ্লবের উদ্‌যাপনের মুহূর্তের ছবিটি তাই হয়ে উঠেছিল খুব সরল। সনাতন দুই বাণিজ্যিক শক্তি স্পেন ও পর্তুগালের বিশ্বসম্পদকে ভাগ করে নেওয়ার আর কোন ক্ষমতা ছিল না। দক্ষিণ আমেরিকার রৌপ্যখনি নিঃশেষিত হয়েছিল। পূর্ব দিকে মশলাবাণিজ্য ও আর অত্যাশ্চর্য মুনাফার জন্ম দিতে পারছিল না। ওলন্দাজরা সপ্তদশ শতাব্দীর উদ্দীপনাকে

আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারেনি। ফ্রান্স সারা আঠারো শতক ধরে রাষ্ট্রিক ব্যর্থতায় ক্ষয়ে যাচ্ছিল এবং অবশেষে এক মহাদেশ কাঁপানো বিপ্লবের মধ্যে তার ব্যর্থ অস্তিত্বের গ্লানিকে মুছে দেবার চেষ্টা করল। শুধু ইংল্যান্ডই ছিল সজাগ টানটান একটি দেশ যে তরুণ সাম্রাজ্যবাদী উদ্দীপনায় বিশ্বের রসদ ভাণ্ডারকে উজাড় করে আনতে পারত। ফলে স্বাভাবিক নিয়মে ইংল্যান্ডই হল শিল্প-বিপ্লবের অগ্রণী দেশ। এ কথাকর অর্থ এই নয় যে, যে—দেশ বাণিজ্যিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পেরেছিল সেই দেশই শিল্প-বিপ্লব ঘটানোর গরিমা অর্জন করেছিল। শিল্প-বিপ্লব একটি দেশের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া মাত্র, সে দেশের সমাজ-সংগঠন, মানবমন ও অর্থনীতির মধ্যে পুঁজিশ্রম ও সংগঠনের প্রকৃষ্ট স্থিতিস্থাপকতা ও পারস্পরিক সংশ্লেষ এবং দেওয়া-নেওয়ার ভারসাম্যের উপর তা নির্ভর করে। বিশ্ববাণিজ্য একটি দেশকে দেয় কাঁচামালের সংস্থান, বাজার, শ্রমের যোগান ও পুঁজি আর দেয় তার নিজের সমাজের মানুষদের এক বড় কর্মক্ষেত্র, অর্থবিনিয়োগের সুবিধা। ইংল্যান্ড তার অভ্যন্তরীণ সংস্থান আর বহির্বাণিজ্যের মেল বন্ধন ঘটাতে পেরেছিল। তাই ইংল্যান্ডেই শিল্প-বিপ্লব সবচেয়ে আগে দেখা দেয়।

১(ক).৫ ইংল্যান্ডে কেন শিল্প-বিপ্লব আগে দেখা দিল?

এটি আপাতভাবে ইতিহাসের একটি বিস্ময় যে ইংল্যান্ডে প্রথম শিল্প-বিপ্লব হল, ফ্রান্সে হল না। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স ছিল একটি শিল্পোন্নত দেশ। তার জনসংখ্যাও ছিল বিপুল। উত্তর আমেরিকায় তার উপনিবেশও ছিল কানাডা থেকে লুইসিয়ানা (Louisiana) পর্যন্ত বিস্তৃত। আঠারো শতকে ভারতবর্ষে ও পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে (West Indies) ফ্রান্সের অগ্রগতিও খারাপ ছিল না। দেশে জনসংখ্যা বেশি থাকায় দেশের শিল্প দেশের ভেতরেই তার বাজারকে খুঁজে পেয়েছিল। তাছাড়া পুঁজির অভাবও ফ্রান্সে ছিল না। কৃষকরা জমি কিনছিল। এর থেকেই বোঝা যায় যে পুঁজির অনুপস্থিতিজনিত সুস্থিতির অভাব কৃষিজগতে পরিলক্ষিত হয়নি। তাছাড়া ফ্রান্সের ছিল এক প্রসারশীল সামুদ্রিক বাণিজ্য যার ফলে তার আমদানি-রপ্তানির মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট হয়নি। পুঁজি শ্রম বাণিজ্য বাজার—এক কথায় অর্থনীতির প্রধান দিকগুলি পর্যাপ্ত থাকায় ফ্রান্সের উৎপাদন কখনো নিম্নাভিমুখী হয়নি। স্বদেশ ও বিদেশের বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে উৎপাদনকে অনায়াসেই বাড়ানো যায়, এ ক্ষমতা ফ্রান্সের ছিল।

তবুও ফ্রান্সে শিল্প বিপ্লবের সূচনা হল না—হল ইংল্যান্ডে। ১৭৮০ থেকে ১৭৯০-এর মধ্যে ইংল্যান্ডের জনসংখ্যা ছিল ৯০ লক্ষ (ইংরাজি পরিভাষায় ৯ মিলিয়ন), কিন্তু শুধু ১৭৮৯ সালেই ফ্রান্সের জনসংখ্যা ছিল ২৬০ লক্ষ (ইংরাজি পরিভাষায় ২৬ মিলিয়ন)। ইংল্যান্ডে এই জনসংখ্যাগত অসুবিধার মধ্যে জন্ম নিল শিল্প-বিপ্লবের প্রথম প্রেরণা যা ফ্রান্সে অধিক জনসংখ্যার মধ্যে রইল অনুপস্থিত। শিল্পের উপর নতুন চাহিদা। শিল্পচাহিদা পূরণ করতে হলে চাই পুঁজি, শ্রম ও সংগঠন। পুঁজি ও সংগঠন ছিল। শ্রম কোথায়? ফ্রান্সে ২৬০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে যথেষ্ট উদ্বৃত্ত শ্রম ছিল যাকে প্রয়োজনে গার্হস্থ্য শিল্পের চাহিদা মেটাতে ব্যবহার করা যেত। কিন্তু ইংল্যান্ডে ৯০ লক্ষ মানুষের মধ্যে উদ্বৃত্ত শ্রমের যোগান প্রায় ছিল না বললেই হয়। ৪০০ লক্ষ পাউন্ড স্টারলিং-এর [ইংরাজি পরিভাষায় £ 40 million] মূল্যের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় মানবশক্তি ফ্রান্সে ছিল ২৬০ লক্ষ অধিবাসী। ইংল্যান্ডে ঠিক একই সময়ে ৩২০ লক্ষ [£ 320] পাউন্ড

স্টার্লিং-এর বহির্বাণিজ্যের জন্য ছিল মাত্র ৯০ লক্ষ মানুষ যাদের মধ্য থেকে উদ্বৃত্ত গার্হস্থ্য শ্রমের (domestic labours) যোগান ছিল প্রায় অসম্ভব। শ্রমের অভাবে যা পূরণ করা সম্ভব নয় যন্ত্রের অভাবে ইংল্যান্ড তা পূরণ করতে চাইল। এইখানেই দেখা দিল যন্ত্র উদ্ভাবনের প্রেরণা, আসল প্রযুক্তি উন্নয়নের ধ্যান, বিজ্ঞানকে ব্যবহার করার চেষ্টা হল কারিগরিতে। বিজ্ঞান ব্যবহৃত হল প্রযুক্তিতে (application of science of technology), আর প্রযুক্তি ব্যবহৃত হতে লাগল উৎপাদনে। শিল্প-বিপ্লবের প্রাথমিক শর্ত প্রতিপালিত হল।

উপরের আলোচনায় একথা কখনো বলা হয়নি যে আঠারো শতকে ইংল্যান্ডের জনসংখ্যা বাড়েনি বা জনসংখ্যার অভাবই ইংল্যান্ডে শিল্প-বিপ্লবের প্রধান কারণ। ফিলিস ডিন দেখিয়েছেন যে আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ইংল্যান্ডের জনসংখ্যা থমকে ছিল, স্থির হয়েছিল ৬০ লক্ষের কাছাকাছি কোন সংখ্যায়। ১৭৪১-১৭৫১-র দশকে তা ৩½ শতাংশ বাড়ে, ১৭৫১-১৭৬১ তে বাড়ে ৭ শতাংশ, ১৭৮০-র দশকে ১০ শতাংশ, ১৭৯০ এর দশকে ১১ শতাংশ এবং অবশেষে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তা বেড়ে হয় ১৬ শতাংশে। উন্নয়নশীল শিল্পের জন্য দরকার হয় গতিশীল মানবশক্তি, স্থিতিশীল সমাজ ও বিস্তারশীল পুঁজি। বহির্বাণিজ্য থেকে আসছিল পুঁজি, দেশের ভেতরে আত্মপ্রকাশ করছিল শ্রমের বিস্ফারিত উৎস। ফিলিস ডিন (Phyllis Deane) একেই 'জনশক্তির বিপ্লব' (Demographic Revolution) বলেছেন। এই বিপ্লবের হাত ধরে এসেছিল আরও তিনটি বিপ্লব। ফিলিস ডিন-এর ভাষায় 'কৃষি বিপ্লব', 'বাণিজ্য বিপ্লব' এবং 'পরিবহন বিপ্লব'। এই সমস্ত ক্ষেত্রে নতুন উদ্ভাবন, উন্নয়নের ত্বরান্বিত গতি, মানুষ ও বস্তুর দ্রুত স্থান থেকে স্থানান্তরে গমনের ক্ষমতা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে শিল্পায়নের সহায়ক শক্তি হিসাবে তারা আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছিল।

ইংল্যান্ডে শিল্প-বিপ্লব আত্মপ্রকাশ করার আরও একটা বড় কারণ হল লোহা ব্যবহারের বিস্তার ও লোহা শিল্পের অগ্রগতি। লোহাকে না গলালে তাকে ব্যবহারযোগ্য করা যায় না, আর লোহা গলানোর জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানির কয়লা ইংল্যান্ডে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। কয়লাকে বলা হত গলানোর জন্য প্রয়োজনীয় 'সবচেয়ে সুলভ শক্তির মৌল উপাদান'। এই উপাদান ইংল্যান্ডে খুব বেশি ছিল। লোহা ও কয়লার খনিগুলি ছিল খুব কাছাকাছি এবং অনেক জায়গায় পাশাপাশি। ওয়েলস্ (Wales), নর্দাম্বারল্যান্ড (Northumberland) এবং স্কটল্যান্ডে (Scotland) এইসব খনিগুলি অবস্থিত ছিল। ফলে নিষ্পন্ন দ্রব্যকে (finished goods) স্থানান্তরে নেওয়া কঠিন হত না। কয়লা ও লোহার সহযোগে ইংল্যান্ডে দেখা দিল **'যান্ত্রিক কারখানা ব্যবস্থা'** ('mechanized factory system')। যার ফলে ন্যূনতম সময়ে ন্যূনতম খরচে এবং ন্যূনতম শ্রমের ব্যবহারের ফলে উন্নতমানের বিপুল পরিমাণ পণ্যের উৎপাদন সম্ভব হল। আর এই উৎপাদনকে তার বহির্বাণিজ্যের নিষ্কাশন পথে মহাদেশের ও সমুদ্রপারের বাজারে চালান করে দেওয়া যেত। এদিকে দেশের ভেতরে বড় কারখানার চারপাশে—ব্রিটেনের মধ্য অঞ্চলের (British Midlands), শেফিল্ড, ইয়র্কশায়ার প্রভৃতি দেশে পেরেক, কাঁটা, ছুরি, ক্ষুর, কাঁচি, চামচ, হাতা ও পাত্র ইত্যাদি ছোট ছোট ধাতব অস্ত্রের ও অন্নের সংস্থান হল। শিল্পোদ্যোগের এই প্রথম পর্যায়ে ইংল্যান্ডের উপনিবেশগুলি থেকে আসত কাঁচামাল আর সেখানে ইংল্যান্ড বিক্রী করত তার উৎপন্ন দ্রব্য (finished products)। নিজের শক্তি প্রয়োগ করে ইংল্যান্ড উপনিবেশের কাঁচামাল কিনত সস্তায় আর নিজের দেশের তৈরি উৎপন্ন মাল বিক্রী করত চড়া দামে। এই **সস্তায় কেনা ও চড়া দামে বিক্রী করার নীতি** (Buying cheap and selling dear) যখন ইংল্যান্ড বহির্দেশে প্রয়োগ করছে তখন ইংল্যান্ডই ছিল একমাত্র যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার দেশ যে **দেশ বিশ্ববাজারের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছিল**

একমাত্র উৎপাদক জাতি হিসাবে। হবসবমের (Hobsbawm) ভাষায় 'a world market largely monopolized by a single producing nation'। এরকম দেশই তার উৎপাদনকারী ও আন্তেপ্রেনিয়রদের দিতে পারে তাদের উদ্যোগের পুরস্কার মুনাফা। এখানে মনে রাখতে হবে যে, ১৭৯৩ সাল থেকে ১৮১৫ সালের মধ্যে অনুষ্ঠিত মহাদেশীয় যুদ্ধগুলিই ছিল ইউরোপে শেষ ইঙ্গ-ফরাসী লড়াই। তারপর থেকে আমেরিকা ছাড়া অন্য কোন স্থানে ইংল্যান্ডের আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না। ("In effect the wars of 1793-1815, the last and decisive phase of century's Anglo french duel virtually eliminated all rivals from the non-European world, except to some extent the young USA"—Eric Hobsbawm)। এইভাবে একমাত্র উৎপাদনকারী দেশ, যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা, অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্ববণিক এই তিন শক্তির মাত্রাকে একত্রিত করে ইংল্যান্ড দখল করে নিল উন্মোচনশীল এক বিশ্ববাজার ইংল্যান্ডের শিল্প-বিপ্লবের রথে পড়ল যুগান্তরের পরিবর্তনশীল বিশ্ব শক্তির টান।

উপরের আলোচনা থেকে যে কথাটি স্পষ্ট হল তা এই রকম। ইংল্যান্ডে কেন শিল্প-বিপ্লব হল তা নিয়ে দুরকম ভাবনা দেখা যায়। প্রথম ভাবনা হল যে শিল্প-বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় দুটি উপকরণ—লোহা আর কয়লা ইংল্যান্ডে যথেষ্ট ছিল এবং এই দুই উপকরণকে কাজে লাগিয়ে শিল্পায়ন ঘটানোর মতো অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও সমাজমন ইংল্যান্ডে তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এই ভাবনার পাশে আছে আরেকটি ভাবনা। তা হল এই যে সমস্ত উপাদান ও আনুষঙ্গিক সাংগঠনিকতা বিন্যাস সত্ত্বেও ইংল্যান্ডে শিল্প-বিপ্লব হত না যদি কিনা তার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ ধরে বিশ্ববিস্তার, বিশ্বের বাজার দখল ও উপনিবেশের কাঁচামালের উপর খবরদারি করার ক্ষমতা না থকত। আসলে এই দুই ভাবনাই একে অন্যের পরিপূরক। একটি ঘটনাকে অন্য ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে শিল্প-বিপ্লবের প্রকৃত চরিত্র বোঝা যায় না। এরপর ধ্রুপদী ঐতিহাসিক নোলস্ এর [L.C.A. Knowles, *The Industrial and Commercial Revolutions in Great Britain during the Nineteenth Century*] একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হল। এই উদ্ধৃতির মধ্যে নিহিত রয়েছে ইংল্যান্ডে কেন প্রথম শিল্প-বিপ্লব হল তার সংক্ষিপ্ত মীমাংসা।

"The reasons for the development of the industrial revolution in Great Britain well that she had a ready command of capital, a scarcity of hands, large and expanding markets, a free population, political security, a training in large scale business for over-seas markets, case of access to those markets through her geographical position and her shipping, while his iron and coal fields provided her with the most valuable raw material and motive power for machinery and for iron something." তাহলে দেখা যাচ্ছে পুঁজি, বাজার ও রসদের উপর আধিপত্য একদিকে, অন্যদিকে জনশক্তির অভাব, জনমনের স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক নিরাপত্তা গভীরভাবে শিল্পায়নের পশ্চাৎ হিসাবে কাজ করেছিল। এর কোনটির অভাব হলে ইংল্যান্ড শিল্পায়নে অগ্রসর হতে পারত না।

১(ক).৬ শিল্পায়নের দুই পর্ব

দুটি পর্বে ইংল্যান্ডে শিল্প-বিপ্লব ঘটেছিল। একপর্বে সড়ক পথে, নদী ও খালের মাধ্যমে, নৌকায় ও

পালতোলা জাহাজে পণ্য সামগ্রী চলাফেরা করত। পরের অধ্যায়ে যন্ত্রের বিস্তার ঘটল বিপুলভাবে। বাষ্পশক্তির ব্যবহার হতে লাগল, রেলব্যবস্থা ও বাষ্পযানের আবির্ভাব ঘটল। বাষ্পপোত, টেলিগ্রাফ ও রেলব্যবস্থা পণ্যের আনা-নেওয়াকে সহজ করল। যোগাযোগকে সরল করল, বিশ্ববাজার দখলকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে এল। তার সাথে তাল রেখে শ্রমের বিন্যাস ও বিভাজন এবং ব্যবসায়িক সংগঠন পরিবর্তিত হল প্রথমে স্থানীয় পর্যায়ে, পরে আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে এবং সর্বশেষে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। বাষ্পশক্তিকে প্রয়োগের দ্বারা প্রযুক্তির পরিবর্তন ও দুটি পর্যায়ে এবং সর্বশেষে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। বাষ্পশক্তিকে প্রয়োগের দ্বারা প্রযুক্তির পরিবর্তনও দুটি পর্যায়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ১৮৩০-এর দশকের আগে বাষ্পশক্তিকে শুধু উৎপদানের কাজে ব্যবহার করা হত। ডেভিড টমসন জানিয়েছেন যে ১৮৩০ সালের পর থেকে বাষ্পশক্তিকে যানবাহন ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হতে লাগল। এরপর থেকে আসতে লাগল বড় মাপের বিস্ময়কর সামাজিক পরিবর্তন। আসল বড় মূলধনি উদ্যোগ, ট্রেড ইউনিয়ন, শহর প্রশাসনের জন্য পৌরসভা। ১৮১৫ সাল নাগাদ ও ইংল্যান্ডের শিল্প শ্রমিকদের একটি ক্ষুদ্র অংশ বড় বহড় কারখানায় (factory) কাজ করত এবং বেশির ভাগ মানুষও তখন নগরায়িত জীবন যাপন করতে শেখেনি। ফ্রান্সেও শিল্প এককগুলি বিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত ছোট ছোট ছিল। একথা জানিয়ে ডেভিড মৈসন্য (David Thompson, Europe since Napoleon) বলেছেন যে পূর্ব ইউরোপে শিল্পায়ন হয়েছিল বিংশ শতাব্দীতে। ইউরোপে বড় শহরের সার্বিক আবির্ভাব হয়েছিল ১৮৭০ সালের পর। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের সূচনাকালে ইউরোপের একটি দেশের অর্থনীতি শিল্পায়িত হয়েছিল। তা হল ইংল্যান্ডের অর্থনীতি। ১৮৫০ সাল নাগাদ লক্ষ করা গিয়েছিল যে স্পেন, পর্তুগাল, স্ক্যান্ডেনেভিয়া, সুইজারল্যান্ড ও বলকান অঞ্চল মিলিয়ে ১০০ মাইল রেল লাইন ইউরোপে পাতা হয়েছিল। তার অর্থ হল যে ১৮৫০ সালের আগে এক ইংল্যান্ড ছাড়া বড় মাপের শিল্পায়ন ইউরোপে আর কোথাও পরিলক্ষিত হয়নি। অর্থাৎ বৃহত্তর অর্থে ইউরোপীয় শিল্প-বিপ্লব উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের ঘটনা, যদিও ১৮৩০-এর দশকে আমেরিকায় ও ১৮৪০-এর দশকে জার্মানিতে শিল্পায়নের প্রারম্ভিক প্রকাশ দেখা গিয়েছিল।

১(ক).৭ শিল্প-বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য

শিল্প-বিপ্লবের প্রথম পর্বের বৈশিষ্ট্য হল যে তা ইংল্যান্ডের অর্থনীতিকে এবং তার সমাজ জীবনকে শিল্পায়িত করে দিয়ে ১৭৫০ থেকে ১৮৫০-এর মধ্যে বিশ্বকোষ রচয়িতারা যাকে বলেছেন 'ব্রিটেন' নামে একটি সর্বাধিক আধুনিক রাষ্ট্রের আবির্ভাবকে সূচিত করেছিল। আর তা করতে গিয়ে পরিবর্তনের কয়েকটি পর্যায়কে তা চিহ্নিত করেছিল। প্রাক্ শিল্পায়িত সমাজে বেশিরভাগ বস্তু উৎপন্ন হত বাড়ির ভেতরে, ছোট কারখানায় বা কারুশালায় (workshops)। আর তা হত ছোটখাটো শ্রমবিভাজনের মধ্য দিয়ে, মানুষের শ্রমশক্তিকে ব্যবহার করে, পশুর পেশী শক্তির উপর নির্ভর করে। হাতযন্ত্র (hand tools) ব্যবহার করে উৎপাদন করা হত। শিল্প-বিপ্লব ভিন্নতর উৎপাদন বৈশিষ্ট্যকে নিয়ে এল। শ্রমের বদলে এল যন্ত্র, কারুশালার বদলে এল বড় ফ্যাক্টরি, পেশীশক্তি ও বায়ুশক্তির বদলে এল প্রথমে বাষ্প এবং পরে বিদ্যুৎশক্তি। জ্বালানি হিসাবে কাঠের বদলে এল কয়লা, ভারবাহিতার আধার হিসাবে কাঠের বিকল্প হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল লোহা। এইভাবে কৃষি ও হাতশস্ত্র অর্থনীতির রূপান্তর ঘটল শিল্পপ্রধান যান্ত্রিক নির্মাণ অর্থনীতিতে (industry and machine manufacture economy)।

এই রূপান্তরের কতগুলি নিশ্চিত বৈশিষ্ট্য ছিল যাকে শুধুমাত্র প্রযুক্তিতে বিজ্ঞানের প্রয়োগ (application of science to technology) বললে ভুল হবে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি আর মানুষ এই ত্রিশক্তির সমন্বিত পরিবর্তন ঘটছিল। এই পরিবর্তনের যদি একটি পর্যালোচনা করা যায় তবে শিল্প-বিপ্লবের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা পাই।

(এক) নতুন মৌল উপাদান (new basic materials) লোহা আর ইস্পাতের অবাধ ব্যবহার।

(দুই) নতুন উদ্দীপনা সম্পদ (new energy resources) জ্বালানি ও সঞ্চালক শক্তির (fuel and motive power) ব্যবহার। এর মধ্যে আছে কয়লা, বাষ্পীয় শকট (steam engine) বিদ্যুৎ পেট্রোলিয়ম ও গ্যাস এবং অভ্যন্তর—দাহ্য যন্ত্র (internal combustible engine)।

(তিন) 'স্পিনিং জেনি' (Spining jenny) ও শক্তিচালিত তাঁত (power loom) ইত্যাদির মতন দ্রুত সঞ্চালনশীল যন্ত্র যার দ্বারা অপেক্ষাকৃত কম মানবশক্তি (human energy) ও পশুশক্তিকে কাজে লাগিয়ে অনেক বেশি, অনেক দ্রুত ও অনেক উচ্চমানের পণ্য উৎপাদন করা যায়।

(চার) কাজের একটি নতুন সংগঠন, যাকে বলা হয় ফ্যাক্টরি ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার দিকগুলি হল নগর কেন্দ্রিকতা, বৃহৎ কারখানার আত্মপ্রকাশ, অধিকতর শ্রমিক নিয়োগ, শ্রমের নবনব বিভাজন, কাজের বিশেষিকরণ (specialization), পরিবহন ও যোগাযোগের নতুন উন্নয়ন, বাষ্পশক্তির অধিকতর ব্যবহার, পুঁজির ঘনীভবন, ঘিঞ্জি বস্তির আবির্ভাব, শ্রমিক জীবনমানের অবনতি এবং এ সবের মধ্য দিয়ে ব্যাপক উৎপাদনবৃদ্ধি এবং শ্রমিক শোষণের মধ্য দিয়ে আগ্রাসী মুনাফালাভের বেপরোয়া তৎপরতা।

(পাঁচ) দ্রুত নগরায়ণ, শ্রমিক শ্রেণীর উত্থান, নতুন শাসনতন্ত্রের আবির্ভাব যার ফলে বংশভিত্তিক শাসন (dynastic rule) উঠে গিয়ে সমাজভিত্তিক শাসন (communitarian rule) আত্মপ্রকাশ করল এবং পুরানো দিনের অবসানে জনগণ 'প্রজা' থেকে হল 'নাগরিক'।

(ছয়) শ্রমিকরা দক্ষ ও অদক্ষে ভাগ হয়ে গেল। নতুন ও বিশেষিত দক্ষতা (new and distinctive skills) নিয়ে আবির্ভূত শ্রমিকের কাজ ও কাজের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক বদলে গেল। হাত ব্যবহারকারী কারিগর (craftsman) থেকে তারা পরিবর্তিত হল যন্ত্রবিদ (machine operator) তথা এক নৈর্ব্যক্তিক এককে (impersonal unit) পরিণত হল।

(সাত) মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক মানবিকতার পরিবর্তে পুঁজি বিনিয়োগ ও শ্রম প্রয়োগের নিরিখে বিচার করা আর্থিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে নিরূপিত হতে লাগল। অর্থাৎ ব্যক্তিগত দেওয়া-নেওয়ার সামন্ততান্ত্রিক বন্ধন খসে গেল।

উপরে বর্ণিত কোন পরিবর্তনই সম্ভব হত না যদি না লোহা ও কয়লার অঙ্গাঙ্গী ব্যবহার না বাড়ত এবং তার সাথে পাল্লা দিয়ে যানবাহন ও যোগাযোগ, এক কথায় পণ্য ও চিন্তার পরিবহন না বাড়ত। আঠারো শতকে ইংল্যান্ড জলকে শক্তি হিসাবে এবং বায়ুকে সঞ্চালক হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু বায়ু ছিল অনিশ্চিত, জলও ছিল সর্বৈব নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তা শুকিয়ে যেত, স্ফীত হয়ে বন্যা হত, জমে গিয়ে

বরফ হত। শিল্প-বিপ্লব জল ও বায়ুর বিকল্প হিসাবে এনে দিল বাষ্পশক্তি—বিস্ময়করভাবে স্বচ্ছন্দ একটি শক্তি যা অনিশ্চিত নয়, শুকিয়ে যায় না বা জমে না। সঞ্চালক শক্তি হিসাবে বাষ্পের ব্যবহার (use of steam as a motive power) শিল্প-বিপ্লবের একটি অনবদ্য বৈশিষ্ট্য। এর দ্বারা উৎপাদনে শ্রমের পৌনঃপুনিক প্রয়োগ বন্ধ হল, মানুষের কায়িক ক্ষয় রোধ হল, মানুষের টেনে নেওয়ার ও উত্তোলনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেল, ফলে শ্রমনিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির (Labour-intensive productive process) হ্রাস পেল এবং পশুশক্তির উপর নির্ভরতা কমে গেল। অর্থাৎ এর পর থেকে যে কোন শক্তিকে (energy) একটি নিশ্চিত সঞ্চালক শক্তিতে (motive power) রূপান্তরিত করার ক্ষমতা মানুষের করায়ত্ত হল। এর আগে অন্য কোন শক্তি, যেমন জল ও বায়ু এতখানি রূপান্তরযোগ্য (transferable) ছিল না। জলকে বাষ্পীভূত করতে হলে চাই জ্বালানি সেটা হল কয়লা। আবার বাষ্পশক্তির চাপ সহ্য করতে পারে এই রকম মজবুত পদার্থের প্রয়োজন হল। কাঠ পচনশীল ও নরম। তাই এল লোহার ব্যবহার। লোহা যখন এল তখন মানুষের উৎখনন— শক্তি ও পণ্য পরিবহন ক্ষমতা বাড়ল। ভাবুন পশুর পিঠে বা নৌকায় মাল আর অন্যদিকে লোহা দিয়ে নির্মিত বিরাট জাহাজ বা শকটে মাল—কোনটির ভারবহন ক্ষমতা বেশি। আবার তুলনা করুন কাঠকয়লার চুল্লি (charcoal furnace) ও বাতচুল্লি (Blast Furnace) কার তাপ প্রদান জনিত বিগলন ক্ষমতা বেশি। এই অতিরিক্ত ক্ষমতাই মানুষের দক্ষতাকে বাড়িয়ে তার সভ্যতাকে ঊর্ধ্বমুখী করবে।

১(ক).৮ ইংল্যান্ড-ভিন্ন অন্য দেশে শিল্প-বিপ্লব

ইংল্যান্ড ভিন্ন অন্য দেশে শিল্প-বিপ্লব দেরিতে এসেছিল। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরিকে নিয়ে যে হ্যাপসবার্গ (Hapsburg) সাম্রাজ্য তা উনিশ শতকে অর্থনীতিগতভাবে একটি শক্তিশালী দেশ ছিল না। এই দেশে ছিল এগারটি প্রধান জাতি (races), দশটি প্রধান ভাষা এবং তেইশটি আইন প্রণয়নকারী সংস্থা [পঠিতব্য Seton Watson, German, Slav and Magyar, p.10]। অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরি উভয় দেশের সরকারের লক্ষ্য ছিল তাদের প্রজাবর্গের মনে উদগত জাতীয়তাবাদের ভাবধারাকে প্রশমিত রেখে সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্যকে স্থির রাখা। এই রাষ্ট্রিক কাঠামে অবিসংবাদিত দুর্বলতাকে কাটাতে না পারায় অস্ট্রিয়া বা হাঙ্গেরি কেউই কৃষি, শিল্প বা বাণিজ্যে কোন প্রসারশীল ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে তাদের অর্থনীতিও সবল ছিল না। শিল্পায়নে নতুন উড়ান (take off) তাদের সম্ভব ছিল না।

ফ্রান্স কয়লা সম্ভারে ছিল দুর্বল, আর হল্যান্ডে কয়লা ছিল না। কয়লা না থাকায় সেখানে শিল্পায়নের ধারা ব্যাহত হয়েছিল। এবং পাশাপাশি আমেরিকা বা জার্মানিতে উৎকৃষ্ট কয়লা পাওয়া যেত বলে তাদের শিল্পায়নের পথে যেতে অসুবিধা হয়নি। ফ্রান্স দীর্ঘদিন ধরে মানববিদ্যা ও কলাবিদ্যায় উন্নতি করেছিল। ফলে তার কারু ও কলা শিল্প সভ্যতার মূল্যবান উপকরণ হিসাবে উচ্চদামে বিক্রয় হত। ফলে ফরাসীদের মানসিকতায় কারিগরি উদ্ভাবনের স্পৃহা ছিল কম। তাছাড়া কলা শিল্প-সামগ্রীর কদর হত তার নিজস্ব গুণমানের উপর তার ফলে এই ধরনের সামগ্রীর রাশিকৃত উৎপাদন (mass production) সম্ভব ছিল না। ফলে আধুনিক শিল্পায়িত উৎপাদনে রাশিকৃত পণ্যের সম্ভার তৈরি করা, তার বিপণনের জন্য বাজার খোঁজা, তার উৎপাদনের জন্য মৌল যন্ত্র তৈরি করা—এর কোনটির দিকে ঝোঁকই ফ্রান্স দেখাতে পারেনি। ফলে ইংল্যান্ডের অনেক আগে থেকে অগ্রসরশীল শিল্প সত্ত্বেও ১৯১৪ সালের আগে ইংল্যান্ডের সমকক্ষ পূর্ণ শিল্পব্যবস্থা ফ্রান্স গড়ে তুলতে পারেনি।

তাছাড়া ফ্রান্সে জনসংখ্যা বেশি থাকায় উদ্বৃত্ত শ্রমের ভাণ্ডার তার ছিল। ফলে শ্রমের অভাব তাকে কখনো ভুগতে হয়নি। অতএব শ্রমের বিকল্প যন্ত্রের উদ্ভাবনের কথা সে ভাবেনি। রাশিয়াতে বেশির ভাগ মানুষ থাকত শহরের বাইরে। সেখানে জারতন্ত্রের নিরঙ্কুশ শাসন ও শোষণে রাষ্ট্রের উদ্যোগ ছাড়া মানুষের ব্যক্তি পর্যায়ে বা সমাজ পর্যায়ে কোন শিল্পোৎসাহ গড়ে উঠতে পারেনি। উনিশ শতকের শেষে ফ্রান্সের পুঁজির বিনিয়োগ হতে থাকে রাশিয়াতে। তারপর থেকে ১৮৯০-১৯১৪ এই সময়ের মধ্যে রাশিয়াতে শিল্পায়ন দেখা দেয়। রাশিয়াতে ১৮৫৫ সালে মোট জনসংখ্যা ছিল ৬০,০০০০০০ বা ছয় কোটি। এর মধ্যে ৪০,০০০০০০ বা চার কোটি ছিল সার্ফ। সমস্ত দেশ দারিদ্র ও দুর্ভিক্ষে ডুবে ছিল। ফলে শিল্প-বিপ্লবের প্রয়োজনীয় পরিবেশ রাশিয়াতে ছিল না।

ইউরোপের শিল্প-বিপ্লবের আলোচনা করতে গেলে স্মরণ রাখতে হবে যে সেখানে সমস্ত মহাদেশ জুড়ে যেখানে যেখানে লোহা আর কয়লা খনি ছিল ঠিক সেখানে বা তার সংলগ্ন স্থানেই এক বিরাট জনবসতির রেখা গড়ে উঠেছিল। গবেষকরা দেখেছেন যে এই খনিরেখা (line of mines) এবং বিস্ফরিত জনবন্ধনী (broad population belt) শুরু হয়েছিল স্কটল্যান্ডে এবং ব্যাপ্ত হয়েছিল মহাদেশের মধ্য পর্যন্ত। সেখান থেকে ভাগ হয়ে একটি শাখা দক্ষিণে চলে যায়, আরেকটি শাখা রয়ে যায় উত্তরের শাখা রূপে। এই উত্তরের শাখার শুরুর বিন্দু হল গ্লাসগো। সেখান থেকে শুরু হয়ে ইংল্যান্ডের ভেতর দিয়ে খনি ও জনবসতির এই বন্ধনী চলে যায় বেলজিয়াম ও উত্তর ফ্রান্সে। তারপর রাইন-অঞ্চল, সার উপত্যকা (Saar valley) হয়ে ওয়েস্টফ্যালিয়া (Westphalia), স্যাক্সনি (Saxony) ও সাইলেশিয়া (Silesia) স্পর্শ করে রাশিয়ার ডনেজ (Donetz) উপত্যকা পর্যন্ত প্রবহমান এইরেখা। খনিরেখার সঙ্গে যুগলমিলনে যে জনবসতির ক্ষেত্র গড়ে ওঠে সেই ক্ষেত্র বরাবর শিল্প-বিপ্লবের অক্ষরেখা তৈরি হয়েছিল। তার উপরেই স্থাপিত হয়েছিল সমস্ত নির্মাণ-শিল্প। এইভাবে প্রকৃতির দেওয়া ক্ষেত্রের উপরই শিল্পায়নের অভ্যুদয় ঘটেছিল। কয়লা আর লোহার ক্ষেত্রগুলি বরাবর এইভাবে জনবসতি গড়ে ওঠা কোন আধুনিক ঘটনা নয়, বরং সভ্যতার অনেক পুরানো ব্যাপার। কিন্তু যখন যন্ত্র আবিষ্কার হতে লাগল তখন উৎখননের জন্য জনশক্তির যোগান সংলগ্ন জনবসতিগুলি থেকে আসতে লাগল। যন্ত্রচালকের কাজ সম্পন্ন করার জন্য মানবশ্রমের চাহিদা পূরণ করেছিল মহাদেশময় সুনিশ্চিত জনবসতির অক্ষরেখা।

১(ক).৯ নতুন আবিষ্কার : কৃষিতে বিপ্লব

শিল্প-বিপ্লবকে বলা হয় নীরবে সংঘটিত একটি ঘটনা। এর প্রস্তুতি চলছিল অনেক দিন ধরে। রেনেশাঁস মানুষের মনকে যুক্তিবাদী করে তাকে ফিরিয়ে এনেছিল পরলোক থেকে ঐহিকতার দিকে। ঐহিকতার মধ্যে লুকিয়ে থাকে প্রত্যক্ষের দাবি, প্রতিনিয়তের চাহিদা, আর তার পরিপূরণের আকাঙ্ক্ষা। ফলে মানব প্রকৃতির সহজ নিয়মে শুরু হল রসায়ন ও পদার্থ বিদ্যার চর্চা, গণিতের বিচার, বলবিদ্যার প্রাথমিক পাঠ। ইতিমধ্যে আবিষ্কার হল মুদ্রাযন্ত্রের, জ্ঞানের বিস্তার সহজ হল। গবেষণা করার, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার মাপজোক করার, হিসাব-নিকাশ করার একটি প্রবণতা আরম্ভ হল। কিছু লোক প্রশ্ন করতে লাগল চাষবাস ও কৃষিজগতের বিভিন্ন রীতিনীতির, কারণ তখন কৃষিই ছিল মানুষের সবচেয়ে বড় শিল্প। ১৭০১ সালে **জেথরো টুল** (Jethro Tull) গভীরভাবে মাটি খননের একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন যার দ্বারা মাটির ভেতর অনেকখানি কেটে বীজবপন করা যেত। জমিকে নতুনভাবে চাষ করার একটি পদ্ধতি আবিষ্কৃত হল। লর্ড টাউনশেন্ড (Lord Townshend) পর্যায়ক্রমে

শস্য চাষ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন। জেথরো টুলের নয়া চাষ পদ্ধতি এবং টাউনশেন্ডের শস্যের পর্যায়ক্রম চাষ (rotation of crops) কৃষিকাজের নতুন দিগন্ত খুলে দিল। এদিকে কৃষিকাজের প্রকরণ নিয়েও ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়েছিল। **হকাম-নিবাসী** জনৈক **কোক** (Coke of Holkham) নতুন কৃষি প্রকরণ তৈরি করেন। জেথরো টুল সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের (১৬৭৪-১৭৪১) মানুষ। তিনি লক্ষ করলেন যে বীজবপনের সনাতন প্রক্রিয়াটি হল হাতে করে বীজ নিয়ে হাওয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া। ইংরাজি ভাষায় তাকে বলা হত *broadcasting handfuls on to the land*। এই পদ্ধতিতে বীজ ইতস্তত মাটিতে ছড়াত এবং অনেক বীজ নষ্ট হত। জেথরো টুল সরলরেখায় মাটি কেটে সারিবদ্ধভাবে (in rows) বীজধান উৎপাদনের প্রক্রিয়া আবিষ্কার করলেন। শুধু তাই নয় ঘোড়া দিয়ে লাঙল চাষের ব্যবস্থাতেও তিনি অগ্রণী ছিলেন। এর ফলে শস্য ক্ষেত্রের আগাছা ও পরগাছা সব বিনষ্ট হত এবং জমি পরিষ্কার থাকত। জেথরো টুলের সমবয়সী ছিলেন লর্ড টাউনশেন্ড (১৬৭৪-১৭৩৮)। তিনি দেখালেন যে একই জমিতে প্রতিবছর একই শস্য চাষ করলে জমির উর্বরতা নষ্ট হয়। তাই তিনি নিজের ক্ষেতে পর্যায়ক্রমে একবছর গম, পরের বছর শালগম, তৃতীয় বছর ওটস্ বা বার্লি এবং চতুর্থ বছর ক্লোভার (clover) বা সেই জাতীয় অন্য শস্য চাষ করে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করলেন। তিনি দেখালেন যে গমের পর যে শুধু শাল গমই চাষ করতে হবে তা নয়, শালগমের মতো শিকড় আছে এইরকম যে কোন শস্যের চাষ করা যাবে। এইভাবে চার বছরে চার শস্যের পর্যায়ক্রমে (four-crop rotation) থাকলে জমির উর্বরতা নষ্ট হয় না। গম জমি থেকে অনেক রসদ শুষে নেয় ফলে জমি নিঃশেষিত হয়। কিন্তু শালগম এতটা নেয় না। বরং শালগম চাষ করার সময়ে জমিকে পরিষ্কার করে নিতে হয়। তাতে আগাছা জমির ক্ষতিসাধন করতে পারে না। শুধু তাই নয়, শালগম জাতীয় ফসল শীতকালে পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হত। ফলে শীতকালে পশুদের বাঁচিয়ে রাখা আরও সহজতর হল। ইতিপূর্বে শীতের প্রারম্ভে অনেক পশুকে হত্যা করা হত কারণ তাদের বাঁচিয়ে রাখা যাবে না বলে। এখন আর তার প্রয়োজন হল না। এর পর থেকে সারা বছর তাজা মাংস পাওয়া সম্ভব হল। তার ফলে ইংরাজদের খাদ্য ব্যবস্থা বদলে গেল। লর্জ টাউনশেন্ডের ব্যবস্থা যে সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র সমানভাবে গৃহীত হয়েছিল তা নয়। তখনও একটা চাষের পর জমিকে অলসভাবে ফেলে রাখার (fallowing) প্রথা চলছিল। প্রথম প্রথম কৃষকরা আপত্তি করলেও পরে পর্যায়ক্রমে শস্যচাষের নীতি তারা মেনে নিয়েছিল এবং তার ফলে ইংল্যান্ডের কৃষি-অর্থনীতি সম্পূর্ণ স্বয়ম্ভর হয়ে পড়েছিল।

আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে **রবার্ট বেকওয়েল** (১৭২৫-১৭৯৫) গার্হস্থ্য পশু প্রজনন (stockbreeding) ও পশুপালনের নতুন পদ্ধতি প্রচলন করেন। আগে মেষ প্রজননে বাছাবাছি করা হত না। **রবার্ট বেকওয়েল** (Robert Bakewell) বিশেষ বিশেষ মেষ বেছে নিয়ে প্রজননের ব্যবস্থা করান। এর ফলে উৎকৃষ্ট লোম ও সুস্বাস্থ্যসম্পন্ন মেষের জন্ম হতে লাগল। গবাদি পশুর ক্ষেত্রে তিনি সাফল্য অর্জন করতে পারনেনি। ১৭৫০ নাগাদ সে কাজ করেছিলেন **চার্লস ও রবার্ট কোলিং** (Charles and Robert Colling)। তাঁরা **শর্ট হর্ন** (shorthorns) বা ছোট শিং বিশিষ্ট এক ধরনের গবাদি পশুর প্রজনন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই শর্ট হর্ন গরুর দুধ ও মাংস ইংল্যান্ডের খাদ্যাভ্যাসকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল। নতুন যে সমস্ত যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হয়েছিল তা দিয়ে চাষ করতে গেলে বড় জমির দরকার হয়। ফলে ছোট ছোট জমিকে একসঙ্গে

রেখে একটি সংলগ্ন বড় অঞ্চলকে ঘিরে ফেলার প্রবণতা দেখা দিল। এই ঘিরে ফেলাকে বলা হত এনক্লোজার (Enclosure)। এই সময়ে শহরে ফ্যাক্টরি ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। অনেক দরিদ্রকৃষক নিজেদের জমিজমা বিক্রী করে মজুর হিসাবে শহরে চলে যাচ্ছিল। তাদের জমিগুলিকে একত্রিত করে বড় জমিতে পরিণত করে যন্ত্রায়িত কৃষির (mechanized farming) জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছিল।

১(ক).১০ নতুন আবিষ্কার : বস্ত্রশিল্পে বিপ্লব

বস্ত্রশিল্পে উৎপাদনে দুটি ভাগ ছিল—সুতো কাটা (spining) এবং তাঁত বোনা (weaving)। তিন ভাবে এই দুই কাজ সম্পন্ন হত—(১) কোন বাড়িতে একটি ছোট যন্ত্র বসিয়ে একটি পরিবারের দু-একজন গেরস্থালি কর্মের মতো তা সম্পাদন করতে পারত; (২) একটি বাড়িতে (house) বেশ কিছু ছোট বড় যন্ত্র বসিয়ে দু-চারটি পরিবার বা এক এলাকার কিছু মানুষ সে কাজ করতে পারত। এই দুই কাজের মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য ছিল না কারন এই উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হত হস্তচালিত যন্ত্র। শুধু তফাত ছিল পুঁজির বিনিয়োগে ও শ্রমের যোগানে যার দ্বারা কাজের কিছু গতিবৃদ্ধি হত। (৩) তৃতীয় পদ্ধতি হল তাঁতযন্ত্রে শক্তি (power) প্রয়োগ করে কাজের গতি বাড়ানো, সময় সঙ্কোচন করা এবং উৎপাদন চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের বিকল্প গড়ে তোলা। তাঁত বোনায় বিপ্লব এনেছিলেন ১৭৬৪ সালে **জেমস হারগ্রিভস** (James Hargreaves)। তিনি **স্পিনিং জেনি** (Spinning jenny) নামে একটি যন্ত্র আবিষ্কার করলেন যার মধ্যে আটটি **স্পিণ্ডল** (Spindle) বা তকলি থাকত। এর দ্বারা ছোট ছোট শলাকার (rod) সাথে লাগিয়ে ভিন্ন ভিন্ন অনেক আঁশকে (yarn) ঘূর্ণায়মান রেখে একসঙ্গে অনেক সুতো কাটা যেত। এর দ্বারা আঁশ বা সুতোর আড়াআড়ি প্যাঁচও (wefts) সম্ভব হল। এরপর ১৭৬৮ সালে আবিষ্কৃত হল **রিচার্ড আর্করাইটের** (Richard Arkwright) জল বা **ওয়াটার ফ্রেম** (water frame)। আড়াআড়িভাবে নিবন্ধ সুতোকে (warps) তাঁত যন্ত্রে বাঁধার এটি ছিল অভিনব পদ্ধতি। ১৭৭২ সালে ডার্বিশায়ারের (Derbyshire) অন্তর্গত ক্রমফোর্ড (cromford) নামক স্থানে তিনি যে কল (mill) স্থাপন করেছিলেন সেখানে তিনি জল শক্তির দ্বারা তাঁর যন্ত্রচালনার ব্যবস্থা করেন। এই দুই যন্ত্রই ধীরে ধীরে বাতিল হয়ে গেল যখন ১৭৭৯ সালে (মতান্তরে ১৭৭৫ সালে) **স্যামুয়েল ক্রম্পটন** (Samuel Crompton) **স্পিনিং মিউল** (Spinning Mule) নামে নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করলেন। পূর্বতন যন্ত্রগুলির বিজ্ঞান ও নক্শাকে কাজে লাগিয়ে এই মিউল তৈরি হয়েছিল। ক্রম্পটনের জীবনকাল ১৭৫৩ থেকে ১৮২৭। অতএব তিনি অপেক্ষাকৃত পরের প্রজন্মের মানুষ। হারগ্রিভসের 'জেনি' এবং আর্করাইটের জল ফ্রেমের থেকে যে সুতো বের হত সে সুতো ছিল মোটা এবং কর্কশ। ১৭৭৯ সালে তিনি **হল-ইথ উড হুইল** (Hall-i'th Wood Wheel)। বলে একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন (তাঁর তন্তুবায় পিতা মাতার সঙ্গে শৈশবে যে বাড়িতে তিনি থাকতেন তার নাম ছিল Hail-i'th wood) এই যন্ত্রই পরে **মিউল** নামে বিখ্যাত হয়। এই যন্ত্রে মসলিনের মতো সরু কাপড় বোনা যেত। পরবর্তীকালে ক্যাম্বিক জাতীয় কাপড়ও এযন্ত্রে বোনা হত। হারগ্রিভস্, আর্করাইট ও ক্রম্পটনকে বলা হয় শিল্প-বিপ্লবের বস্ত্রশিল্পের ত্রয়ী। তাঁরা তুলা থেকে সুতো (cotton spining) এবং সুতো থেকে তাঁত বোনা (cotton weaving) শিল্পে বিপ্লব এনে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে লম্বা এবং ছোট উভয় রকম পশমই 'জেনি' এবং 'মিউলে' বোনা হত। ১৮২ সালের মধ্যে হস্তচালিত যন্ত্রে পশম ও সুতোর কাটার কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।